জাতীয় বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত
ব্রিটিশরাজ নিষিদ্ধ রচনা সংকলন

মুক্তি কোন্ পথে

সম্পাদনা
অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

যুগান্তরের পথ, 'মুক্তি কোন্ পথে' অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ৯-৩০
ব্রিটিশ সরকারের গোপন নথিতে 'মুক্তি কোন্ পথে' ৩১-৩২
আলোকচিত্র ও নথিপত্র ৩৩-৪৮
'মুক্তি কোন্ পথে'র নামপত্র ৪৯
'মুক্তি কোন্ পথে'র প্রথমভাগের উৎসর্গপত্র ৫১
'মুক্তি কোন্ পথে'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ৫৩
'মুক্তি কোন্ পথে'র দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ৫৮

মুক্তি কোন্ পথে— প্রবন্ধসূচি

॥ প্রথম ভাগ ॥

আমাদের রাজনীতিক আদর্শ ৫৯
উন্নতি ও স্বাধীনতা ৬৩
সাহিত্য ও স্বাধীনতা ৬৬
দেশে লোক কই ৬৯
দেশে একতা কই ৭২
স্বদেশপ্রেমের ব্যাধি ৭৮
রুচিবিকার ৮২
বঙ্গদেশে অভাব কি? ৮৬
মণ্ডলী গঠন ৯১

॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥

পাগলের চিন্তা ৯৫
সম্মোহন ৯৭
খাদ্য ও খাদক ৯৮
কলকারখানায় বিপদ ১০৩
ইংরাজ পরিচালিত কাপড়ের কল ১০৬

বিরোধ ও শত্রুতা ১০৮
কৃতঘ্নের স্পর্ধা ১১১
আত্মবিস্মৃতি ১১৩
স্বত্ব ভিক্ষা ১১৫
নূতন ও পুরাতন ১১৭

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

রাজনীতিক ভিক্ষাবৃত্তি ১২১
ইংলন্ডের উদারনীতি ও আমাদের দেশ ১২৫
যুবক শক্তিই জাতীয় বল ১২৭
যোগাক্ষ্যাপার চিঠি (১) পরিচয় ১২৯
প্রতাপাদিত্য ১৩২
ধর্মরাজ্য ও মহারাজা শিবাজী (১) ১৩৩
যোগাক্ষ্যাপার চিঠি (২) বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ১৩৮
বিপ্লব তত্ত্ব। লোকমত গঠন। ১৪৩
ভূত ও ভবিষ্যৎ ১৪৫
প্রেরিত পত্র। অনন্তানন্দের প্রতিবাদ ১৪৮
যুগধর্মতত্ত্ব ১৫০

॥ চতুর্থ ভাগ ॥

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ ১৫৩
ধর্মরাজ্য ও মহারাজা শিবাজী (২) ১৫৫
যোগাক্ষ্যাপার চিঠি (৩) কংগ্রেস ১৫৯
সামাজিক ভেদ ও স্বাধীনতা ১৬১
প্রেরিত পত্র। মিলনসূত্র। ১৬৩
প্রেরিত পত্র। ইতিহাসের সাক্ষ্য দান। ১৬৪
বিপ্লব তত্ত্ব। অস্ত্রসংগ্রহ। ১৬৬
ধর্ম ও স্বাধীনতা ১৬৮
যোগাক্ষ্যাপার চিঠি (৯) হাত গুটানো গোয়ার্ত্তামি ১৭২
বিপ্লব তত্ত্ব। অর্থসংগ্রহ। ১৭৬
ভারতে আবার গীতার যুগ ১৭৮

যুগান্তরের পথ, 'মুক্তি কোন্ পথে'

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের উদ্ধত ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় একদল বাঙালি যুবক অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের। তাঁদের হাতে ছিল বোমা-রিভলবার, লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বরাজ — স্বাধীনতা। 'হিংসার বদলে হিংসার' নীতিতে স্থিত ছিল তাঁদের বিশ্বাস। সেই আবেগপ্রবণ প্রাণচঞ্চল যুবকেরা উপলব্ধি করেছিলেন সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা প্রচারের জন্য প্রয়োজন একটি পত্রিকার। তাদের বৈপ্লবিক সমিতির প্রয়োজন মুখপত্রের। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে এই মুক্তিকামী যুবকের দল তথা বাংলার বৈপ্লবিক সমিতি প্রকাশ করে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা — যুগান্তর।

সমসময়ের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা যখন আবেদন-নিবেদনের নরমপন্থায় প্রতিবাদ সংগঠিত করছেন, সেইকালে, প্রথম সংখ্যা থেকেই 'যুগান্তর' ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, দেশের মানুষকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানায়। উত্তরোত্তর এই পত্রিকার সুর চড়তে থাকে। দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সাপ্তাহিকটি।

ব্রিটিশরাজ চুপ করে থাকেনি। ১৯০৭-এর মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশে সংবাদপত্রের উপর নেমে আসে সরকারি আঘাত। প্রথম কোপ পড়ে যুগান্তরের উপর। আঘাত অগ্রাহ্য করে প্রকাশিত হতে থাকে যুগান্তর। কিন্তু ক্রমাগত দমন-পীড়ন অভিযান চলে পত্রিকাটির উপর। পাস হয়ে যায় সংবাদপত্র-বিষয়ক কালাকানুন — Newspapers (Incitement to offences Act)। এই আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে ১৯০৮-এর মধ্যভাগে যুগান্তর বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এই ঐতিহাসিক পত্রিকাটি দুষ্প্রাপ্য। মাত্র কয়েকটি সংখ্যাই রক্ষা পেয়েছে।

যুগান্তরের পাতায় ১৯০৬-১৯০৭-এর মধ্যে যেসব রচনা বেরিয়েছিল তার একটি নির্বাচিত সংকলন — 'মুক্তি কোন্ পথে' প্রকাশ করেছিলেন যুগান্তরের সম্পাদক-কর্মীরা। চারখণ্ডে বিন্যস্ত এই সংকলনটির প্রকাশক ওই পত্রিকার ম্যানেজার বা কর্মাধ্যক্ষ 'শ্রী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য'। প্রকাশকাল — "সন ১৩১৩ সাল। ১লা মাঘ।" 'মুক্তি কোন্ পথে'র প্রথম ভাগটি প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৯০৭। দ্বিতীয় ভাগ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭। তৃতীয়-চতুর্থ ভাগ বেরিয়েছিল ১৯০৮-এর গোড়ার দিকে।

'মুক্তি কোন্ পথে'র রচনাগুলি পড়লেই বোঝা যায়, ব্রিটিশ-বিরোধী চরমপন্থী

আন্দোলনের সেই প্রথম যুগে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, তা জনাকয়েক ভাবপ্রবণ যুবকের নিছক উন্মাদনা নয়, তার একটি রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি ছিল, আদর্শ ছিল। ছিল নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং কর্মসূচি। যুগান্তর তথা 'মুক্তি কোন পথে'র প্রবন্ধমালায় পাওয়া যায় স্বাধীনতার জন্য সম্পূর্ণ এক নতুন পথের সন্ধান।

যুগের তুলনায় একেবারে নতুন কথা বলবার চেতনা এই বিপ্লববাদী যুবকেরা আয়ত্ত করলেন কীভাবে? রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কারপন্থী চিন্তার সময় থেকে ধাপে ধাপে বাঙালি যুবা কেমনভাবে পৌঁছে গেলেন চরমপন্থায়? কোন কোন সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার স্তর পেরিয়ে তাঁদের এই বিপ্লবী দর্শনের উন্মেষ ঘটল? এই প্রেক্ষাপটটি জেনে-বুঝে নিলে, 'মুক্তি কোন্ পথে'-র রচনাগুলি এবং রচয়িতাদের মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করতে সুবিধা হবে। এজন্যই আমাদের জেনে নিতে হয় 'মুক্তি কোন্ পথে'র আগের একশো বছরের দিক্-চিহ্নগুলিকে।

১৭৯৩ সালে ইংরেজরা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু করেছিল। এই বন্দোবস্তে, যাঁরা ছিলেন রাজস্ব আদায়কারী তাঁরাই হলেন চিরস্থায়ী জমিদার। এই ব্যবস্থার ফলে উদ্ভূত জমিদারশ্রেণি তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজের বন্ধু হয়ে উঠল। ব্রিটিশরাজ মিত্র হিসাবে পেয়ে গেল কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ এক বিপুল ক্ষমতাবান, বিত্তবান শ্রেণিকে। পাশাপাশি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং আরো কয়েকটি ইউরোপীয় কোম্পানি ব্যাবসার স্বার্থে একটি ধনবান ব্যবসায়ী শ্রেণির সৃষ্টি করল বঙ্গদেশে। ইংরেজ কোম্পানিগুলি এইসব ব্যবসায়ীদের শুধুমাত্র নিজেদের কোম্পানির সুনাম (goodwill) ব্যবহার করতে দিত, কাঁচামাল আর টাকার জোগান দিত বাংলার এই ব্যবসায়ীকুল। এদের বলা হত মুৎসুদ্দি। মুৎসুদ্দি আর 'চিরস্থায়ী' জমিদার শ্রেণি মিলে বাংলায় জন্ম নিল একটি অবসরভোগী শ্রেণি।

ইংরেজশাসন দৃঢ়মূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সামান্য ইংরেজি জানা বাঙালিরা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে নিযুক্ত হয়েছেন। এইসব সামান্য-ইংরেজি-জানা, চাকুরিরত মধ্যবিত্তরা ক্রমশ হয়ে উঠলেন দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণি। মূলত এদের থেকেই বেরিয়ে এলেন আইনজীবী, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি। এই সময়েই শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারিরা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে বাঙালি পাঠকদের জন্য বই প্রকাশ করছেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য — হিন্দুধর্মকে আক্রমণ এবং খ্রিস্টধর্মের প্রচার-প্রসার।

তখন হিন্দুধর্মও নানান কুসংস্কার-কুআচার-আকীর্ণ এবং সর্বোপরি তা পুরোহিতশ্রেণির শোষণযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এই সংকটকালে হিন্দুশাস্ত্র-দর্শনে সুপণ্ডিত, পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত, ইউরোপীয় চিন্তাভাবনায় উদ্বুদ্ধ এবং ফরাসি বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) সমস্ত কুসংস্কার, কুআচারের প্রভাব ছাড়িয়ে সমাজে যুক্তিনিষ্ঠ ধ্যানধারণার প্রবর্তন করলেন। রামমোহন তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদ রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রচার করেননি, করলেন ধর্ম আর সামাজিক

ক্ষেত্রে। তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি করেন। একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি, মুসলমান এবং খ্রিস্টান গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন আবার পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। বঙ্গদেশে নতুন চিন্তা, নবজাগৃতির পথ তৈরি হয় এই সময়েই।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চার ফলেই 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর অভ্যুত্থান। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র নেতৃত্বে একদল সংস্কারমুক্ত, বেপরোয়া তরুণ দলের আবির্ভাব। তাঁরা সবরকমের সনাতন আচার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। বিদেশি শাসক আর দেশের প্রজাদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য দূর করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। আবার ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রেও কোনোরকম আধিপত্য মানতে চাইলেন না তাঁরা। এই সংস্কারপন্থীদের প্রভাবে নানান ধরনের সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে উঠল। একাধিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হল। পাশ্চাত্যশিক্ষায় যারা শিক্ষিত হলেন তারা একদিকে পেলেন শেকসপিয়র, মিলটন থেকে স্কট, বায়রন পর্যন্ত আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ আবার লক-হিউম থেকে টমাস পেন পর্যন্ত আধুনিক যুক্তিবাদী শিক্ষা। টমাস পেনের 'The Age Reason' সেইযুগেই পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮১৮ থেকে ১৮৫৮-র সূচনা পর্যন্ত বাঙালি হিন্দুসমাজে এই যুক্তিবাদী শিক্ষার আলোড়ন চলে। এই আলোড়নের ফলে আবহমানকালের ধর্মীয় সংস্কার এবং রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে নানান প্রশ্ন উঠতে থাকে। এইসব সনাতন সংস্কারকে আর স্বতঃসিদ্ধের মতো মেনে নিতে রাজি নয় যুবারা। সমাজে দেখা দেয় বৈপরীত্য।

এদিকে যারা সনাতনপন্থী, রক্ষণশীল এবং ইংরেজ সরকারের প্রসাদপুষ্ট তারা স্বাভাবিকভাবেই এই সংস্কারবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাল্টা স্রোত সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হলেন। এইসব রাজভক্তদের বেশিরভাগ বসবাস করতেন উত্তর কলকাতার উত্তরাংশে। তাঁরা দোল-দুর্গোৎসবে হুল্লোড় করতেন, ইংরেজদের আমন্ত্রণ করে বাইজিনাচ দেখাতেন। এঁদের বংশধরেরাই রূপচাঁদ পক্ষীর দল করে নেশাতুর জীবনযাপন করেছেন। 'হাফ আখড়াই'-এর দল এবং এমনতর নানান অশ্লীলতার জন্ম দিয়েছেন এরাই।

উত্তর কলকাতার দক্ষিণাংশে বাস করতেন পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত সংস্কারপন্থীরা। তাই দেখা গেল উত্তর কলকাতার দক্ষিণাংশে যখন 'সতীদাহ' প্রথা উচ্ছেদ করবার জন্য সংস্কারপন্থীরা উঠে পড়ে লেগেছেন তখন উত্তরাংশে রাজা রাধাকান্ত দেব ধনীদের নিয়ে 'ধর্মসভা' গঠন করে ওই বর্বর, অমানবিক প্রথাকে রক্ষা করবার ফতোয়া দিচ্ছেন। দক্ষিণাংশে যখন 'ব্রহ্মসভা'র মাধ্যমে এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ স্থাপিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মাধ্যমে ধর্মসংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে তখন উত্তরাঞ্চলে ওই 'ধর্মসভা'র মাধ্যমে ধর্মীয় গোঁড়ামি বজায় রাখার চেষ্টা হচ্ছে।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এ এক অতীব আকর্ষক অধ্যায়। একদিকে

হিন্দুসমাজের বিত্তবান রক্ষণশীলরা 'ধর্মসভা'কে কেন্দ্র করে চলাফেরা করছেন আর অন্যদিকে উদারপন্থীরা, যুবকেরা, সংস্কারপন্থীরা সব ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করছেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়সভা'-তে যোগ দিচ্ছেন। দক্ষিণাংশে গৌরমোহন আড্যির স্কুল আর ব্রহ্মসভার অভিভাবকত্বে 'বেদবিদ্যালয়' স্থাপিত হয়েছে, উত্তরাংশে চলছে সনাতন ব্রাহ্মণ্যবাদী কার্যকলাপ। উত্তরাংশে যখন একরকম অজ্ঞানতার অন্ধকার তখন ১৮৬৭ সালে দক্ষিণাংশে শুরু হয়েছে হিন্দুমেলা। ভারতবর্ষকে 'স্বদেশ' বলে ভক্তির সেই সূত্রপাত।

প্রসঙ্গত বলে রাখা যাক, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে উত্তর কলকাতায় এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়। এই সময়েই দেখা গেল, একটু অবস্থাপন্ন হলেই পরিবারে ধ্রুপদাঙ্গের সংগীতচর্চা শুরু হয়েছে, ফারসিভাষা শেখার প্রচলন হয়েছে। হিন্দুমেলা বা জাতীয় মহামেলার প্রভাবে পাড়ায় পাড়ায় ব্যায়ামাগার স্থাপনের উদ্যোগ দেখা দিয়েছে। বাংলাভাষায় ইংরেজি ধরনের নাটক অভিনয় করবার তোড়জোড় চলছে। শুরু হয়েছে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির উদ্যোগ। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'প্যারীচাঁদ মিত্র'র সমাজ-নকশা 'আলালের ঘরে দুলাল'। ওই বছরেই প্রকাশিত হয়েছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনীর উপাখ্যান'। ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্র-র 'নীল দর্পণ'। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' ইতিমধ্যে নতুনতর স্বাদ নিয়ে এসেছে সাহিত্যে। তারপরে ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী'। এই সময়েই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বাংলায় লিখলেন দুটি মূল্যবান জীবনী — মাৎসিনি আর গ্যারিবল্ডী। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'ভারত সংগীত'। ১৮৮০ সাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হতে থাকল।

ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) এবং আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) সংস্কার আন্দোলনের প্রবাহকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এনে দিয়েছেন। স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমূল সংস্কারপন্থী তরুণ সমাজ ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলনের থেকে রাজনীতিক সংস্কার আন্দোলনে বেশি বেশি করে আগ্রহী হয়ে পড়ল। এই রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের সূচনার অবশ্য একটি আর্থ-সামাজিক যুক্তি আছে। যার খোঁজ পাওয়া যাবে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ-উত্তর সমাজব্যবস্থায়।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ সামরিক শক্তির নির্ভরে দমন করা গেলেও শাসকশ্রেণি উপলব্ধি করেছিল ভারতের জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভকে, তাদের বৈপ্লবিক শক্তিকে শুধু একা তাদের পক্ষে বেশিদিন দমিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। এজন্যই, এক দূরপ্রসারী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে, তারা দেশের রাজন্যবর্গ, জমিদার গোষ্ঠী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে আবার নতুন করে উদ্যোগ নেয়। এই মোর্চা গড়ে তোলবার জন্য সামন্তশ্রেণি, জমিদারশ্রেণিকে কৃষির ক্ষেত্রে শোষণের অবাধ অধিকার দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী

ভারতের রাজন্যবর্গকেই এদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান স্তম্ভরূপে তাকে আরও শক্তিশালী করে তোলবার সিদ্ধান্ত নেয়। এর আগের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি ভারতীয় সামন্ত রাজ্যগুলিকে গ্রাস করবার, জমিদারদের অধিকৃত কৃষিজমির আয়তন সীমাবদ্ধ করবার যে নীতি চালু করেছিলেন, পরিত্যক্ত হয়। গৃহীত হয় সর্বরকমের সামাজিক, ধর্মীয় কুসংস্কারকে সুরক্ষিত করবার নীতি। ফলে, সারা দেশ জুড়ে ক্রমশ বেড়ে ওঠে সামাজিক-অর্থনৈতিক শোষণ। শোষণ- সর্বস্ব এই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে জন্ম নেয় বিভিন্নরকমের শ্রেণিচেতনা। জেগে ওঠে আত্মরক্ষা ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার এক নতুন বোধ। ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের এক নতুন ধ্বনি। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগ্রাম নতুন করে আরম্ভ হয়। শহরে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী মুৎসুদ্দি তথা ভারতীয় ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য ব্রিটিশ শাসকশ্রেণিকে চাপ দিতে উদ্যোগী হয়। নতুন নতুন শিল্প থেকে শ্রমিকশ্রেণিও তাদের অধিকারের লড়াই সংগঠিত করতে শুরু করে। এরই পাশাপাশি ইংরেজি ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। প্রত্যেক বছর বেড়ে উঠতে থাকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষিত বেকার সম্প্রদায়ের দুর্দশা চরম আকার নেয়। তার ওপর এই সময় শুরু হয় দুর্ভিক্ষ। ১৮৭৭-এর দুর্ভিক্ষে প্রায় ষাট লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ হারায়। কৃষক এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির সামনে ধ্বংসের ছবি। এই চরম আর্থিক দুর্দশা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলে। তারা বুঝতে পারে ব্রিটিশ সরকারের অপশাসন-এর জন্য দায়ী। বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্রমশ মনে হতে থাকে ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কারের চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বড়ো কিছু সংস্কার জরুরি।

জাতীয়তাবাদ উন্মেষের প্রধান তিনটি উপাদান ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় তৈরি হয়ে গেছে. প্রথম উপাদান, বিপুল অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধি এবং ভারতের নিজস্ব শিল্পবিকাশের ঘোরতর বিরোধী এক স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়ক বিদেশি সরকার। দ্বিতীয়, ভারতের ক্রমবর্ধমান ধনিক শ্রেণি। এবং তৃতীয় উপাদান, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অর্থনৈতিক সংকটজনিত কারণে ব্যাপক বিক্ষুব্ধ ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই তিনটি উপাদানের প্রতিক্রিয়া। বিদেশি অপশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় বিদ্রোহের অগ্রদূতরূপে এগিয়ে আসে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন কয়েকটি সদ্যোজাত সংবাদপত্রের মাধ্যমে। এইসব সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৮ সালে একটি দমনমূলক আইন জারি করে — দেশীয় প্রেস আইন। এতে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা অনেকাংশেই খর্ব হয়। কিন্তু ইংরেজিভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে বুদ্ধিজীবীদের ইংরেজ আক্রমণ অব্যাহত থাকে।